بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ মোতাবেক ০৪ তাবুক, ১৪০৫ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে যখন পরিপূর্ণ মানব হিসেবে সৃষ্টি করে সমগ্র মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ বানিয়েছেন, তখন তাঁর মাঝে প্রতিটি উত্তম চরিত্র সৃষ্টি করে সেগুলোকে **'খুলুকে আযীম'** বা সুমহান চরিত্রে পরিণত করেছেন এবং মু'মিনদের উপদেশ দিয়েছেন, তোমরা যদি নিজেদের মাঝে পূতপবিত্র গুণাবলি সৃষ্টি করতে চাও এবং নৈতিকতার সর্বোচ্চ মান অর্জন করতে চাও, তাহলে এই মহান রসূলের অনুসরণ করো, আর এটিই তোমাদের জন্য খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হবে। মহানবী (সা.) একদিকে যেমন আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অনুযায়ী (নিজের) প্রত্যেক নৈতিক গুণকে সর্বোত্তম মানে উপনীত করেছেন, তেমনিভাবে মু'মিনদেরও উপদেশ দিয়েছেন– (তোমরা) এর সর্বোচ্চ মান অর্জনের চেষ্টা করো। আজকাল যেহেতু তাঁর (সা.) পবিত্র জীবনচরিতের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, এরই ধারাবাহিকতায় আজ আমি **'তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ্'** বা আল্লাহ্র ওপর নির্ভরতা সম্পর্কে তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক, তাঁর মর্যাদা, মু'মিনদের প্রতি তাঁর উপদেশ এবং তাঁর নিজের আমল বা ব্যবহারিক আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করব।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন সূত্রে ও বিভিন্ন স্থানে তাওয়াক্কুল বা খোদানির্ভরতা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। এক স্থানে তাঁকে (সা.) সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ○ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ○ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ○ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

(সূরা আল-আহযাব:৪৬-৪৯)

অর্থাৎ, **হে নবী! নিশ্চয় আমরা তোমাকে প্রেরণ করেছি জগতের জন্য তত্ত্বাবধায়ক, মু'মিনদের সুসংবাদদাতা এবং কাফিরদের জন্য সতর্ককারীরূপে। আর আল্লাহ্র নির্দেশে তাঁর প্রতি আহ্বানকারী এবং এক প্রদীপ্ত সূর্য হিসেবে প্রেরণ করেছি। আর মু'মিনদের সুসংবাদ দাও যে, তারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মহা কৃপা লাভ করবে। আর কাফির ও মুনাফিকদের কথা কখনোই মেনো না এবং তাদের কষ্ট দেওয়াকে উপেক্ষা করো। আর সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র ওপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভর করো, আর কার্যনির্বাহীক হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।**

অতএব, এটি যেমন তাঁর (সা.) জন্য একটি সুসংবাদ, তেমনিভাবে এটি মু'মিনদের জন্যও সুসংবাদ, যদি তারা ঈমানের ওপর অবিচল থাকে, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলি মেনে চলে এবং আল্লাহ্ তা'লার সত্তার ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল বা আস্থা রাখে, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্যও প্রত্যেক বিপদে যথেষ্ট হবেন।

এরপর মু'মিনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ** (সূরা আত-তাগাবুন:১৪)। **আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই, আর মু'মিনদের আল্লাহ্র ওপরই নির্ভর করা উচিত**। অতএব, (তারা) যদি আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের দায়িত্ব

পালন করে এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভরসা করে, তাহলে তারা নিদর্শনাবলিও দেখতে পাবে, যার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত আমরা মহানবী (সা.)-এর সত্তায় দেখতে পাই এবং তাঁর বদৌলতে তাঁর সাহাবীরা (রা.) এর দ্বারা (আধ্যাত্মিক) কল্যাণ লাভ করেছেন এবং আমাদের সামনে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর জীবনের ঘটনাবলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এ বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, প্রাঞ্জল ও উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয় যে, মহানবী (সা.) এমন এক সর্বোচ্চ স্তরের মানুষ যাঁর ভেতর বাহির ছিল অভিন্ন, যিনি স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী, খোদার জন্য জীবন বাজি রাখার চেতনায় উজ্জীবিত এবং সৃষ্টিকূলের ভয় ও তাদের প্রতি আশা-আকাঙ্ক্ষা রাখা হতে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ আর কেবল খোদার ওপরই আস্থাশীল ছিলেন। নবীদের (জীবনের) ঘটনাবলিতে এমন বিপদসংকুল পরিস্থিতি দেখা দেওয়া, আবার খোদার ওপর ভরসা করে প্রকাশ্যে শিরক ও সৃষ্টিপূজা থেকে এভাবে বারণকারী এবং এত শত্রু সত্ত্বেও এমন অবিচল ও দৃঢ়পদ অন্য একজনও প্রমাণিত নন।

তিনি (আ.) আরও বলেছেন, **নবীদের মর্যাদাও অনেক উন্নত মানের, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর খোদানির্ভরতার যেসব দৃষ্টান্ত রয়েছে, সেসব দৃষ্টান্ত তাঁদের জীবনেও পাওয়া যায় না।**

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, 'তাবাত্তুল' অর্থাৎ খোদা তা'লাকে ভালোবাসা এবং জগতকে পরিত্যাগ করা– এর বাস্তব দৃষ্টান্ত হলেন আমাদের পয়গম্বর (সা.)। কারো প্রশংসার প্রতিও তাঁর কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না, আর তিরস্কারের প্রতিও নয়। *অর্থাৎ তিনি কারো প্রশংসার কিংবা কারো ভর্ৎসনারও কোনো তোয়াক্কা করতেন না।* হেন কোনো কষ্ট নেই যার তিনি সন্মুখীন হন নি, কিন্তু কোনো ভ্রূক্ষেপই করেন নি। কোনো লোভ বা প্রলোভন তাঁকে (সা.) সেই কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে নি যা তিনি (সা.) খোদার পক্ষ থেকে করতে এসেছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজের মাঝে এই অবস্থা পর্যবেক্ষণ না করে এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত (তার) কখনও নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। *তিনি (আ.) উপদেশ দিয়ে বলেছেন, এই মর্যাদা অর্জনের জন্য চেষ্টা করা উচিত। নিশ্চিন্ত না হয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভরসা করার এমন উচ্চ মানে উপনীত হওয়া উচিত যেখানে কেবল আল্লাহ্ তা'লার সত্তাই দৃষ্টিপটে থাকবে।*

তিনি (আ.) আরও বলেন, অতঃপর এ বিষয়টিও স্মরণ রাখার যোগ্য, যে ব্যক্তি 'মুতাবাত্তিল' (তথা জগদ্‌বিমুখ) হবে, সে 'মুতাওয়াক্কিল' (তথা আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভরশীল)ও হবে। অর্থাৎ মুতাওয়াক্কিল হবার জন্য মুতাবাত্তিল হওয়া শর্ত। *অর্থাৎ যদি আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করতে হয়, তাহলে এর জন্য আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিনত হওয়াও আবশ্যক।* কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যদের সাথে এমন সম্পর্ক থাকে অর্থাৎ তাদের ওপর ভরসা ও নির্ভর করা হয়, ততক্ষণ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা কীভাবে হতে পারে? যখন কেউ সম্পূর্ণরূপে খোদার হয়ে যায় তখন জগতের সাথে সম্পর্ক বিছিন্ন করে এবং খোদার সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়। আর এটি তখনই সম্ভব যখন খোদার প্রতি পূর্ণ ভরসা থাকে। যেভাবে আমাদের সম্মানিত নবী (সা.) পূর্ণরূপে খোদাতে নিবেদিত ছিলেন, তেমনিভাবে তিনি পূর্ণরূপে খোদার প্রতি নির্ভরশীলও ছিলেন। আর এ কারণেই এত প্রতাপশালী এবং বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর নেতাদের প্রতিও তিনি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করেন নি এবং তাদের বিরোধিতায় তিল পরিমাণও প্রভাবিত হন নি। খোদা তা'লার সত্তায় তাঁর এক অসাধারণ বিশ্বাস ছিল, আর এ কারণেই এত বিশাল ও সুমহান বোঝা তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন এবং সমগ্র বিশ্বের

বিরোধিতা ও তাদের অস্তিত্বকে কিছুই মনে করেন নি। এটি খোদানির্ভরতার এমন এক মহান দৃষ্টান্ত যার তুলনা পৃথিবীতে দেখা যায় না। কারণ এমতাবস্থায় খোদাকে ভালোবেসে জগতকে বিরোধী বানিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু এই অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত সৃষ্টি হয় না যতক্ষণ খোদার দর্শন লাভ না হয়; যতক্ষণ এই প্রত্যাশা সৃষ্টি না হয় যে, এরপর দ্বিতীয় দরজা খুলতে যাচ্ছে। যখন এই প্রত্যাশা ও বিশ্বাস জন্মে, তখন সে খোদার পথে আত্মীয়স্বজনকেও শত্রুতে পরিণত করে নেয়; কারণ সে জানে, খোদা তাকে আরও বন্ধু মিলিয়ে দেবেন। সে সহায়সম্পত্তি বিসর্জন দিয়ে দেয়, কারণ সে এর চেয়ে উত্তম কিছু পাবার বিশ্বাস রাখে। সারকথা হলো, খোদার সন্তুষ্টিকে অগ্রগণ্য করাই হলো তাবাত্তুল আর তাবাত্তুল এবং তাওয়াক্কুল যমজ, *অর্থাৎ একে অপরের সাথে যুক্ত।* তাবাত্তুলের রহস্যই হলো তাওয়াক্কুল এবং তাওয়াক্কুলের শর্ত হলো তাবাত্তুল। এ বিষয়ে এটিই আমাদের বিশ্বাস। *আল্লাহ্ তা'লার প্রতি যখন সম্পূর্ণরূপে বিনত হবে এবং জগতের ওপর নির্ভরতা দূর করবে, কেবল তখনই প্রকৃত তাওয়াক্কুলের অবস্থা সৃষ্টি হবে। আর যেমনটি আমি বলেছি এবং আমরা সবাই জানি, এর সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত হলেন আমাদের মনিব ও অভিভাবক হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)।* হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

এটি মনে কোরো না যে, আল্লাহ্ তা'লা দুর্বল; তিনি মহাশক্তিধর সত্তা। যখন কোনো বিষয়ে তাঁর প্রতি ভরসা করবে, তিনি অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করবেন। وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ (সূরা আত-তালাক:৪) আর কেউ যদি আল্লাহ্ তা'লার ওপর নির্ভর করে, তবে আল্লাহ্ই তার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু যারা এসব আয়াতের প্রথম সম্বোধিত ছিলেন, তারা ছিলেন ধর্মপরায়ণ। তাদের যাবতীয় চিন্তাভাবনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল কেবল ধর্ম এবং তাদের জাগতিক বিষয়াদি খোদার হাতে সমর্পিত ছিল। এজন্য আল্লাহ্ তা'লা তাদের আশ্বস্ত করেছেন যে, আমি তোমাদের সাথে আছি। বস্তুত, তাকওয়ার বরকতগুলোর মধ্যে একটি হলো, আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীকে এমন সব বিপদ থেকে মুক্তি দান করেন যা ধর্মীয় বিষয়াদির পথে প্রতিবন্ধক। একইভাবে আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীকে বিশেষভাবে রিযক দান করেন। এখানে আমি আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা মারেফাতের রিযকের কথা উল্লেখ করব। *তিনি (আ.) বস্তুগত রিযকের কথা বলছেন না, তত্ত্বজ্ঞানের রিযকের কথা বলছেন।* মহানবী (সা.) উম্মী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জন্য সমগ্র বিশ্বের মোকাবিলা করা অবধারিত ছিল, যার মাঝে আহলে কিতাব, দার্শনিক, উচ্চপর্যায়ের জ্ঞানীপিপাসু ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু তাঁকে (সা.) এত অধিক আধ্যাত্মিক রিযক প্রদান করা হয়েছিল যে, তিনি সবার ওপর বিজয়ী হয়েছিলেন এবং তাদের সবার ভুলত্রুটি বের করেছিলেন। এটি এমন এক আধ্যাত্মিক রিযক ছিল, যার কোনো দৃষ্টান্ত নেই।

এ বিষয়ে হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যদি তোমরা আল্লাহ্র ওপর সত্যিকার অর্থে নির্ভর করো তবে অবশ্যই তোমাদের সেভাবে রিযক দেওয়া হবে যেভাবে পাখিদের দেওয়া হয়। *এখানে জাগতিক রিযকের বিষয়েও তিনি (সা.) বলেছেন।* তারা সকালে খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে।

হযরত আবু যার (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন, "দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি মানে হালালকে হারাম করে নেওয়া নয়, আর সম্পদ বিনষ্ট করাও নয়। *সম্পদের প্রতি নিরাসক্তির অর্থ এই নয় যে, যেসব জিনিস বৈধ– সেগুলোকেও অবৈধ বলে দিল, যেরূপ বলাটা বর্তমান যুগের কিছু পীর-ফকিরের রীতি।* বরং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি হলো, তোমার দুই হাতে যা আছে, তা যেন আল্লাহ্র হাতে যা আছে– তার চেয়ে তোমার কাছে অধিক

নির্ভরযোগ্য না হয়।” এটিই হলো অনাসক্তি যে, তোমার কাছে নিজের যে সম্পদ রয়েছে এবং তোমার অধিকারভুক্ত রয়েছে, তার চেয়ে যেন এ কথার ওপর বেশি বিশ্বাস থাকে যে, আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা থেকে আমি বেশি লাভবান হবো। আর বিপদের কারণে পুণ্যের ভাগী হওয়া সম্পর্কে তোমরা যেন এমন হও যে, যখন তোমাদের ওপর কোনো বিপদ আসে, তখন তোমরা সেটি হতে উদ্ভূত কল্যাণের প্রতি এভাবে আগ্রহী থাকবে যে, হায়! এটি যদি তোমাদের জন্য স্থায়ী হয়ে যেত। সুতরাং এটিই হলো তাওয়াক্কুল; নিজের কাছে থাকা বস্তুর চেয়ে এ কথার ওপর বেশি বিশ্বাস থাকবে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার প্রয়োজন পূর্ণ করবেন। আমার কিছু জিনিস হয়ত নষ্ট হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কাছে যা আছে তা কখনও নষ্ট হয় না, আর তাওয়াক্কুলকারী এবং নেক আমলকারী প্রয়োজন অনুযায়ী নিরবচ্ছিন্নভাবে তা পেতে থাকে।

হযরত আমর বিন আস (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আদম সন্তানের হৃদয় থেকে প্রতিটি উপত্যকার দিকে একটি পথ বের হয়। যে ব্যক্তির হৃদয় এর সবকটি পথের অনুসরণ করে, তাকে আল্লাহ্ কোন উপত্যকায় পরিচালিত করবেন বা ধ্বংস করবেন– সেটির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওপর তাওয়াক্কুল করে, বিভিন্ন পথে চলার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ই তার জন্য যথেষ্ট হবেন।

এই হাদীসের যে ব্যাখ্যা রয়েছে তাতে লেখা আছে, এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি নিজ অন্তরকে কেবল বিভিন্ন কামনাবাসনা, চিন্তাভাবনা ও জাগতিক দুশ্চিন্তার অধীনে রাখে এবং (অন্য) সব দিকে তার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত থাকে, তার বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লার কোনো মাথাব্যথা থাকে না– সে কোন প্রান্তরে গিয়ে ধ্বংস হয়। সে কোথায় গিয়ে বাঁচে আর কোথায় মরে– আল্লাহ্ এর কোনো পরোয়া করেন না। وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ অর্থাৎ যে আল্লাহ্‌র প্রতি বিনত হয়, আল্লাহ্ তা'লা তার বিভিন্ন ও বিক্ষিপ্ত প্রয়োজন, দুশ্চিন্তা ও অভাবের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং সেগুলো পূরণ করে দেন। এ অর্থের সমর্থন এই রেওয়ায়েত থেকেও পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার সমস্ত চিন্তাকে একটিমাত্র চিন্তায় তথা ধর্মের চিন্তায় পরিণত করে; অর্থাৎ সে এটির প্রতি লক্ষ রাখে যে, তার ধর্মের কী অবস্থা, আল্লাহ্ তা'লার সাথে তার সম্পর্ক কেমন তা দেখে, নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থা কেমন তা দেখে; তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তার ইহকাল ও পরকালের অন্য সকল চিন্তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। এই হাদীসের এটিই অর্থ।

মহানবী (সা.) কত সূক্ষ্মভাবে আল্লাহ্ তা'লার ওপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতাকে সামনে রেখে নিজের দৈনন্দিন বিষয়াদির জন্য দোয়া করতেন! হযরত উম্মে সালামা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন নিজের বাড়ি থেকে বের হতেন তখন বলতেন, *আমি এর অনুবাদ পড়ছি:*

“আল্লাহ্‌র নামে (বের হচ্ছি), আমি আল্লাহ্‌র ওপর তাওয়াক্কুল করি। হে আল্লাহ্! আমরা এ থেকে তোমার আশ্রয় চাই যে, আমরা পদস্খলিত হবো বা আমরা পথভ্রষ্ট হবো, অথবা আমরা অন্যায় করব বা আমাদের ওপর অন্যায় করা হবে, অথবা আমরা মূর্খতাসুলভ আচরণ করব বা আমাদের সাথে মূর্খতাসুলভ আচরণ করা হবে।”

একইভাবে আরও একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত বুরায়দা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন নিজ গৃহ থেকে বাইরে বের হতেন তখন বলতেন:

"আল্লাহ্‌র নামে (বের হচ্ছি), আমি আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করলাম। আর আল্লাহ্‌ তৌফিক বা কৃপাতেই পুণ্য করার শক্তি এবং মন্দ থেকে বাঁচার সামর্থ্য অর্জিত হয়। হে আল্লাহ্‌! আমি এ থেকে তোমার আশ্রয় চাই যে, আমি পথভ্রষ্ট হবো বা আমাকে পথভ্রষ্ট করা হবে, আমি পদস্খলনের শিকার হবো বা আমাকে পদস্খলিত করা হবে, আমি কারো ওপর অন্যায় করব বা আমার ওপর অন্যায় করা হবে, আমি মূর্খতায় লিপ্ত হবো বা আমার সাথে মূর্খতাসুলভ আচরণ করা হবে এবং আমি কারো সাথে বাড়াবাড়ি করব বা আমার বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করা হবে।"

সবগুলো বিষয় এর মাঝে চলে এসেছে, এতে সবকিছুরই পরিবেষ্টন হয়ে গেছে।

একইভাবে গৃহে প্রবেশের দোয়ারও উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত আবু মালিক আশআরি (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, "যখন কোনো ব্যক্তি তার গৃহে প্রবেশ করে তখন তার বলা উচিত, **হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার কাছে গৃহে প্রবেশের কল্যাণ প্রার্থনা করি এবং ঘর থেকে বের হবার কল্যাণ প্রার্থনা করি। আল্লাহ্‌র নামে আমরা প্রবেশ করি এবং আল্লাহ্‌র নামেই আমরা বের হই। আর আল্লাহ্‌র ওপরই আমরা তাওয়াক্কুল করি যিনি আমাদের প্রভু-প্রতিপালক**। এরপর সে যেন তার বাড়ির লোকদের সালাম দেয়।" অর্থাৎ সে যেন প্রথমে এই দোয়া পড়ে এবং তারপর গৃহে প্রবেশ করে বাড়ির লোকদের সালাম দেয়।

এরপর তাঁর (সা.) তাওয়াক্কুল এবং খোদাভীতি অবলম্বন সংক্রান্ত একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক এই রেওয়ায়েতটি বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) হযরত বিলাল (রা.)-র নিকট গমন করেন। মহানবী (সা.) তার কাছে খেজুরের একটি স্তূপ দেখে বলেন, "হে বিলাল! এগুলো কী?" হযরত বিলাল (রা.) নিবেদন করেন, "এগুলো কিছু খেজুর যা আমি আপনার (সা.) জন্য জমিয়ে রেখেছি।" তিনি (সা.) বলেন, "হে বিলাল, তোমার জন্য আক্ষেপ! তোমার কি এই ভয় নেই যে, কিয়ামতের দিন জাহান্নামে এর ধোঁয়া উঠবে? *অর্থাৎ তা শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।* হে বিলাল! খরচ করো এবং আরশের মালিকের পক্ষ থেকে অভাব-অনটনের ভয় কোরো না। তাঁর ওপর ভরসা করো।"

হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.) এ প্রসঙ্গে বলেন, মানুষের ঈমানে তখনই উন্নতি সাধিত হতে পারে যখন সে খোদা তা'লার নির্দেশের ওপর পরিচালতি হয় এবং খোদার ওপর নিজের ভরসা বা আস্থা বলবৎ রাখে। একবার মহানবী (সা.) বিলাল (রা.)-কে দেখেন, তিনি কিছু খেজুর জমা করছেন। তিনি (সা.) বলেন, কিসের জন্য এমনটি করছ? তিনি (বিলাল) বলেন, আগামীকালের জন্য জমা করছি। তিনি (সা.) বলেন, তুমি কি আগামীকালের খোদার প্রতি বিশ্বাস রাখো না? যে খোদা আজ তোমাকে দিচ্ছেন তিনি কি আগামীকাল তোমাকে দেবেন না; এর প্রতি কি তোমার ঈমান নেই? কিন্তু তিনি (আ.) একথাও বলেছেন এবং স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এর অর্থ এমন নয় যে, কেবল অপচয় করতে থাকবে; কিছু মানুষের হাত খোলা থাকে এবং তারা সঞ্চয় করে না। তিনি (আ.) বলেন, কিন্তু এই কথাটি মহানবী (সা.) বিলালকে বলেছিলেন, প্রত্যেককে বলেন নি এবং প্রত্যেককে তার সহ্যক্ষমতা অনুযায়ী উপদেশ দেওয়া হয়। তিনি (আ.) বলেন, এই উপদেশটি অবশ্যই মহানবী (সা.)-এর ব্যাপারে; কারণ হাদীসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর ব্যাপারেই তিনি (রা.) বলেছিলেন, আপনার জন্য জমা করছি; তাই তিনি (সা.) বলেছিলেন, আমার তো তাঁর (অর্থাৎ খোদার) প্রতি ভরসা রয়েছে, এর ধোঁয়া তো আমার কাছেই পৌঁছাবে যদি তা আমার জন্য রাখা হয়ে থাকে। কিন্তু কিছু মানুষকে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী এই উপদেশও দেওয়া হয়েছে, এতটা অপচয় কোরো না যে, আর কিছুই থাকবে না; বরং কিছুটা পার্থিব

উপায়-উপকরণেরও ব্যবস্থা করো এবং তারপর আল্লাহ্ তা'লার ওপর তাওয়াক্কুলও করো যেন তিনি এসব উপকরণকে সুরক্ষিত রাখেন এবং সেগুলো থেকে কল্যাণ লাভ করার তৌফিক দান করেন।

তাওয়াক্কুল বা ভরসা করার অর্থ এটি নয় যে, সতর্কতা অবলম্বন করা হবে না এবং উপকরণ ব্যবহার করা হবে না। এটিও ইসলামী শিক্ষা পরিপন্থি। হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, **জনৈক ব্যক্তি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি কি উটের হাঁটু বেঁধে এরপর তাওয়াক্কুল করব, নাকি সেটিকে খোলা ছেড়ে দিয়ে তাওয়াক্কুল করব। তিনি (সা.) বলেন, সেটির হাঁটু বাঁধো এরপর তাওয়াক্কুল করো।** এটি একটি দৃষ্টান্ত, অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করা যেতে পারে। রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) এমনটি তখন বলেছিলেন যখন একজন বেদুইন অথবা এক রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত আমর বিন উমাইয়া (রা.) নিজের উট মহানবী (সা.)-এর মসজিদের দরজায় খোলা ছেড়ে দেন এবং নামাযের জন্য ভেতরে চলে যান। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বিশদ বিবরণ এভাবে বর্ণনা করেছেন,

"মানুষের উচিত তাকওয়াকে হাতছাড়া না করা আর খোদার প্রতি ভরসা করা। তাহলে তার কোনো প্রকার কষ্ট হতে পারে না। খোদার প্রতি ভরসা করার অর্থ এমন নয় যে, মানুষ বাহ্যিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা ছেড়ে দেবে। বরং এর অর্থ হলো, ষোলোআনা চেষ্টা-প্রচেষ্টা করার পর পরিণাম খোদার হাতে ছেড়ে দেওয়া, আর এর নামই তাওয়াক্কুল। যদি সে বাহ্যিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা না করে এবং শুধু তাওয়াক্কুল করে তাহলে তার তাওয়াক্কুল অন্তঃসারশূন্য। আর যদি শুধুমাত্র বাহ্যিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে তার প্রতি ভরসা করে যে, আমি বাহ্যিক উপকরণ ব্যবহার করেছি, এটিই যথেষ্ট; আল্লাহ্র প্রতি ভরসা করার প্রয়োজন নেই, এবং খোদার প্রতি তাওয়াক্কুল না করে, তাহলে সেই বাহ্যিক চেষ্টা-প্রচেষ্টাও অন্তঃসারশূন্য; সেই চেষ্টা-প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যাবে। জনৈক ব্যক্তি উটের ওপরে আরোহিত ছিল এবং মহানবী (সা.)-কে দেখে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নীচে নামে এবং সংকল্প করে– সে তাওয়াক্কুল করবে, কিন্তু বাহ্যিক কোনো প্রচেষ্টা করবে না। এজন্য সে নিজের উটের হাঁটু বাঁধে নি। মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে আসার পর দেখে, তার উটটি নেই। ফেরত এসে সে মহানবী (সা.)-এর কাছে অভিযোগ করে যে, আমি ভরসা করেছিলাম কিন্তু আমার উট হারিয়ে গেছে। তিনি (সা.) বলেন, তুমি ভুল করেছ। প্রথমে উটের হাঁটু বেঁধে এরপর তাওয়াক্কুল করলে সেটি সঠিক হতো।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর কাছে কিছু দিনার আসে। তিনি (সা.) ছয়টি দিনার ছাড়া সবগুলো বিতরণ করে দেন। সেগুলো তিনি তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীদের মাঝে একজনের কাছে গচ্ছিত রাখেন। আরেকটি রেওয়ায়েতে আছে, মহানবী (সা.) নিজের অন্তিম অসুস্থতার সময় হযরত আয়েশা (রা.)-র বুকের সাথে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন, তখন তিনি (সা.) বলেন, হে আয়েশা! সেই স্বর্ণের দিনারগুলো কোথায়? হযরত আয়েশা (রা.) নিবেদন করেন, সেগুলো আমার কাছে গচ্ছিত আছে। তিনি (সা.) বলেন, সেগুলো আল্লাহ্র পথে ব্যয় করো। এরপর রোগের তীব্রতার কারণে মহানবী (সা.) অচেতন হয়ে পড়েন। *সেগুলো গচ্ছিত রাখার কারণ ছিল, কোনো সময়ে যেন সেগুলো বিতরণ করতে পারেন।* তখন মহানবী হযরত আয়েশা (রা.)-র বুকের সাথে হেলান দিয়ে ছিলেন। যখন মহানবী (সা.) কিছুটা সুস্থ বোধ করেন তখন তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, হে আয়েশা! সেই স্বর্ণের দিনারগুলো কি খরচ করে ফেলেছ? তিনি (রা.) নিবেদন করেন, না; আল্লাহ্র কসম,

হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এখনো করি নি। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি (সা.) সেই দিনারগুলো আনান। যখন সেগুলো নিয়ে আসা হয় তখন তিনি (সা.) সেগুলো নিজের হাতের তালুতে রেখে গুণে দেখেন, ছয়টি দিনার ছিল। তিনি (সা.) বলেন, মুহাম্মদের নিজের প্রভুর প্রতি কেমন তাওয়াক্কুল হবে, যদি খোদার সাথে সাক্ষাৎ করার আর পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার বেলায় এই দিনারগুলো তার কাছে থেকে যায়! অতঃপর মহানবী (সা.) সেসব দিনার আল্লাহ্‌র পথে সদকা করে দেন এবং সেদিনই তাঁর (সা.) মৃত্যু হয়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلٰنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ, **তুমি (তাদের) বলে দাও, আমাদের কাছে তা-ই পৌঁছায় যা আল্লাহ্ আমাদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। তিনিই আমাদের অভিভাবক, আর আল্লাহ্‌র ওপরই মু'মিনদের ভরসা করা উচিত**। মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শে আমরা দেখতে পাই, তিনি (সা.) কীভাবে এক স্থানে আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসার এক সুমহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ রয়েছে তাঁর প্রতি ভরসা করার, আর তিনি (সা.) স্বয়ং কীভাবে এর ওপর আমল করতেন। যখন মুসায়লামা কাযযাব নিজের সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাঁর (সা.) আনুগত্য করার ঘোষণা দেয় কিন্তু সাথে শর্তও জুড়ে দেয়, তখন তিনি (সা.) বলেন, কোনো শর্ত গ্রহণ করা হবে না বরং [তিনি (সা.) তা] কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি (রা.) বলেন, মুসায়লামা কাযযাব মহানবী (সা.)-এর যুগে আসে এবং বলে, যদি মুহাম্মদ (সা.) তাঁর পর আমাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেন, তাহলে আমি তাঁর অনুসারী হবো। আর সে মদীনায় তার সৈন্যবাহিনীসহ, অনেক লোকজন সাথে করে নিয়ে এসেছিল। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তার সঙ্গে এক লক্ষ মানুষ ছিল; অর্থাৎ তার অনুসারী ছিল, হয়ত (এর চেয়ে) কমই এসে থাকবে। মহানবী (সা.) তার কাছে যান। তাঁর (সা.) সাথে হযরত সাবেত বিন কায়েস বিন শাম্মাস (রা.) ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর হাতে একটি খেজুরের ডাল ছিল। মহানবী (সা.) যখন মুসায়লামা কাযযাবের সামনে এসে দাঁড়ান, সে তখন তার সাথিদের সাথে বসা ছিল। তিনি (সা.) বলেন, তুমি আমার কাছে এই কাঠের টুকরোটি চাইলেও আমি তোমাকে তা দেবো না। আর তুমি কখনোই আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তকে অতিক্রম করতে পারবে না, যা তোমার জন্য নির্ধারিত আছে। (আর) তুমি যদি পিঠ দেখিয়ে চলে যাও তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তোমার মূলোৎপাটন করে দেবেন। আর আমি তোমাকে সেই ব্যক্তি বলেই মনে করছি যার সম্পর্কে আমাকে স্বপ্নে অনেক কিছু দেখানো হয়েছে। *এর আগে সে এই কথা বলেছিল যে, আপনি আমাকে আপনার পরবর্তী স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করুন।* যাহোক, তিনি (সা.) বলেন, এই ডালটির সমপরিমাণ কিছুও তোমাকে দেওয়া হবে না। আমি স্বপ্নে যা দেখেছি, তা-ই এখন আমি দেখতে পাচ্ছি। আর এ হলো সাবেত। *এখানে 'সাবেত' আসলে কোনো শব্দ বুঝানো হয় নি; বরং সাবেত সেই সাহাবীর নাম, যিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন।* তিনি (সা.) বলেন, এ হলো সাবেত, *অর্থাৎ সাবেত হলো আমার প্রতিনিধি,* যে আমার পক্ষ থেকে তোমাকে উত্তর দেবে। এ কথা বলে তিনি (সা.) তাকে রেখে ফিরে যান। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর এই উক্তি– 'আমি তোমাকে সেই ব্যক্তি হিসেবেই দেখতে পাচ্ছি, যার সম্পর্কে আমাকে স্বপ্নে অনেক কিছু দেখানো হয়েছে'– (এ বিষয়ে) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) আমাকে বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'একবার আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। এমন সময় আমি আমার হাতে দুটি সোনার কঙ্কন দেখতে পাই। এ দুটো

আমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে। এরপর স্বপ্নে আমার প্রতি এমর্মে ওহী হয়, আমি যেন সেগুলোর ওপর ফুঁ দেই। আমি সেগুলোর ওপর ফুঁ দিলে সেগুলো উড়ে যায়। এর ব্যাখ্যা আমি মনে করি, এরা হবে দুই মিথ্যাবাদী, যারা পরবর্তীতে প্রকাশ পাবে। এদের একজন আনসী, অপর জন হলো মুসায়লামা।

আসওয়াদ আনসী ও মুসায়লামা ছিল সেই দুই ব্যক্তি যারা বিদ্রোহমূলক আচরণ করেছিল। তখন তো সেখান থেকে চলে গিয়েছিল, পরবর্তীতে হযরত আবু বকরের যুগে তারা যুদ্ধও করেছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ প্রসঙ্গে অনেক বিস্তারিত লিখেছেন; তিনি লেখেন:

রসূলে করীম (সা.) কোনো কাজের ক্ষেত্রেই জগতের বা জগদ্‌বাসীদের প্রতি মোটেও ভ্রূক্ষেপ করতেন না। কোনো জাগতিক উপায়-উপকরণের প্রতি তিনি সামান্যও চোখ তুলে তাকাতেন না। বরং প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে খোদা তা'লার প্রতিই তাঁর (সা.) দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত যে, তিনিই কিছু একটা করবেন। অন্য কথায়, তিনি খোদানির্ভতার এক মূর্তিমান দৃষ্টান্ত ছিলেন, যাঁর তুলনা পূর্ববর্তী নবীদের মাঝেও দেখতে পাওয়া যায় না, কিংবা তাঁর (সা.) পরেও তাঁর মতো তাওয়াক্কুল অবলম্বনকারী কোনো মানুষ জন্মেছে। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় মুসায়লামা এক দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাঁর (সা.) কাছে মদীনায় আসে এবং তাঁর (সা.) কাছে এই নিবেদন জানায়, তিনি (সা.) যদি তাঁর পর তাকে নিজের খলীফা মনোনীত করেন, তাহলে সে নিজ দলবলসহ তাঁর (সা.) অনুসারী হবে। আর ইসলামের তখনকার অবস্থায় এটিই যৌক্তিক ছিল– *যেহেতু ইসলাম তখন খুবই দুর্বল অবস্থায় ছিল*– তিনি (সা.) যেন এই উপায়ই অবলম্বন করেন এবং তার সাহায্য-সমর্থন দ্বারা উপকৃত হন। কিন্তু যে পবিত্র সত্তা খোদা তা'লার শক্তির ওপর আস্থা ও তাওয়াক্কুল রাখতেন, আর মানবীয় শক্তির বিন্দুমাত্রও পরোয়া করা যাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না– তিনি তার এই আবেদন তৎক্ষণাৎ নাকচ করে দেন। বলে দেন, এটি সম্ভব নয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন; *একটু পূর্বে আমি যে হাদীসটি বর্ণনা করেছি, সেটিই এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে;* মুসায়লামা কাযযাব মহানবী (সা.)-এর যুগে আসে এবং বলে, যদি মুহাম্মদ (সা.) তাঁর পর আমাকে শাসক মনোনীত করেন, তাহলে আমি তাঁর অনুসারী হবো। আর সে তখন নিজের সাথে নিজ জাতির বিপুল সংখ্যক লোকজন নিয়ে এসেছিল। মহানবী (সা.) এ কথা শুনে তার কাছে যান এবং তাঁর (সা.) সাথে হযরত সাবেত বিন কায়েস বিন শাম্মাস (রা.) ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর হাতে একটি খেজুরের ডাল ছিল। মহানবী (সা.) যখন মুসায়লামা কাযযাবের সামনে এসে দাঁড়ান, সে তখন তার সাথিদের সাথে বসা ছিল। তিনি (সা.) বলেন, তুমি আমার কাছে এই শাখাটি চাইলেও আমি তোমাকে তা দেবো না। আর খোদা তোমার জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন, তুমি কখনোই তা অতিক্রম করে যেতে পারবে না। আর তুমি যদি পিঠ দেখিয়ে চলে যাও তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তোমার পায়ের রগ কেটে দেবেন। আর আমি তোমাকে সেই ব্যক্তি বলেই মনে করছি যার সম্পর্কে আমাকে স্বপ্নে অনেক কিছু দেখানো হয়েছে। আর এ হচ্ছে সাবেত, সে তোমাকে আমার পক্ষ থেকে উত্তর দেবে। এ কথা বলে তিনি (সা.) সেখান থেকে ফিরে যান। *যেমনটি আমি পূর্বেও বর্ণনা করেছি*, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, মহানবী (সা.)-এর এ কথার অর্থ কী– 'আমি তোমাকে সেই ব্যক্তি হিসেবেই দেখতে পাচ্ছি, যার সম্পর্কে আমাকে স্বপ্নে অনেক কিছু দেখানো হয়েছে'? তখন হযরত আবু হুরায়রা (রা.) আমাকে বলেন, মহানবী (সা.) বলেছিলেন, 'একবার আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। এমন সময় আমি আমার হাতে

দুটি সোনার কঙ্কন দেখতে পাই। আমার এ দুটোকে ভালো লাগে নি। তখন স্বপ্নেই আমার প্রতি এমর্মে ওহী হয়, আমি যেন সেগুলোর ওপর ফুঁ দেই। আমি সেগুলোর ওপর ফুঁ দিলে সেই দুটি উড়ে যায়। আমি (মনে মনে) এর ব্যাখ্যা করি, আমার পরে দুই মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে। এদের একজন আনসী, অপরজন হলো মুসায়লামা।

এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ্ তা'লার ওপর মহানবী (সা.)-এর কেমন দৃঢ়বিশ্বাস ছিল এবং তিনি খোদা তা'লার সাহায্য লাভের বিষয়ে কতটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাঁর চারদিকে কাফিরদের প্রবল প্রতাপ ছিল, যারা সবসময় তাঁকে দুঃখ দিত এবং কষ্ট দেবার কাজে লিপ্ত থাকত আর সম্ভাব্য সকল উপায়ে তাঁকে কষ্ট দিত। রোম ও পারস্য সম্রাটও তাদের নিজ নিজ শাসকদেরকে তাঁর মোকাবেলার জন্য একের পর এক নির্দেশ পাঠাচ্ছিল। বনু গাসসান যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ইরানীরা এই ক্রমবর্ধমান শক্তিকে ঈর্ষা ও বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখছিল এবং প্রতিটি সরকার এই নতুন আন্দোলনের ওপর সন্দেহ ও সংশয়ের দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল। এমন সময়ে যতক্ষণ না মহানবী (সা.)-এর চারপাশে এক বিশাল সেনাবাহিনী জড়ো হতো, তাঁর জন্য নিজ শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া বাহ্যত কঠিন, বরং অসম্ভব বলে মনে হচ্ছিল। মদীনা মুনাওয়ারা থেকে শুরু করে মক্কা মুকাররমা পর্যন্ত বিজয়গুলো তাঁকে আশেপাশের প্রতিটি সরকারের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। আর দূরদর্শী দৃষ্টিগুলো প্রাথমিক পর্যায়েই এই ক্রমবর্ধমান শক্তিকে ধ্বংস করে দেবার চিন্তায় মগ্ন ছিল। কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল, এই শক্তি যদি আরও বেশি বৃদ্ধি পায়, তবে তা আমাদের বড়ো বড়ো সুরম্য প্রাসাদের প্রতিটি ইট খসিয়ে দেবে।

অতঃপর মহানবী (সা.) এই বিশাল প্রদর্শনীর মোকাবেলায় যে প্রস্তুতিই নিন না কেন, তা কম হতো। মানুষের বুদ্ধি এমন অবস্থায় যেভাবে বন্ধু এবং শত্রুকে নিজের সাথে যুক্ত করতে চায় এবং যেসব কলাকৌশল দ্বারা অন্যদেরও নিজের অন্তর্ভুক্ত করতে চায়, তা ইতিহাস পাঠকদের কাছে সহজেই বোধগম্য হতে পারে। কিন্তু আমার প্রেমাস্পদ [মহানবী (সা.)] কোনো পার্থিব সত্তা ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন ঐশী সত্তা। ক্রমবর্ধমান সেনাবাহিনী আর ধাবমান অশ্বরাজি, উন্নত বর্শা ও চকচকে তরবারিকে তিনি কোনো পরোয়াই করতেন না। তিনি ঊর্ধ্বলোকের ফেরেশতাদের অবতরণ দেখছিলেন, আর আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা তাঁর কানে প্রতি মুহূর্তে সান্ত্বনাবাণী শোনাচ্ছিলেন। তাঁর হৃদয় দৃঢ়বিশ্বাসে এবং মন ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল। সংক্ষেপে, পার্থিব উপায়-উপকরণের ওপর ভরসা করার পরিবর্তে তাঁর তাওয়াক্কুল ছিল খোদার ওপর। অতএব এসব বিপদে তিনি কীভাবে ঘাবড়ে যেতে পারেন! তিনি মুসায়লামা ও তার সেনাবাহিনীর ওপর ভরসা করাকে এক মুহূর্তের জন্যও সমীচীন মনে করেন নি। আর পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, খিলাফতের ধোঁকা দিয়ে তোমাকে নিজের সাথে মেলানো এবং তোমার সম্প্রদায়ের সাহায্য লাভ করা তো দূরে থাক; একটি খেজুরের ডালের বিনিময়েও যদি তোমার সমর্থন লাভ করতে হয়, তাহলে আমি সেদিকে চোখ তুলেও তাকাব না।

এই আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন হৃদয়ের অবস্থার প্রতি মনোযোগ দাও। সেই তাওয়াক্কুল অবলম্বনকারী মানুষটির মর্যাদার দিকে দৃষ্টি দাও। দৃঢ়বিশ্বাসে পূর্ণ অন্তরের এই অবস্থার অনুভূতি নিজেদের হৃদয়ে সৃষ্টি করে দেখো, কেমন দৃঢ়বিশ্বাস এবং তাওয়াক্কুলের বলে বলীয়ান হয়ে তিনি মুসায়লামাকে উত্তর দিচ্ছেন। কোনো রাজা কি এমন পরিস্থিতিতে এরূপ সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করতে পারে? ইতিহাস কি রক্ত-মাংসে গড়া কোনো মানুষকে এমন পরিস্থিতি থেকে এভাবে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে দেখাতে পারে? যদি না পারে, তবে এর কারণ কী? এর কারণ কেবল এটাই যে, তাঁর জীবনের সাথে তুলনা করাই ভুল। কারণ, তিনি নবী

ছিলেন। যদি তাঁর কোনো তুলনা করা যায়, তবে তা নবীগণের সাথেই হতে পারে। কিন্তু তিনি যে মর্যাদা লাভ করেছেন, তার দৃষ্টান্ত নবীগণের মাঝেও পাওয়া যায় না। কারণ, সকল নবীর ওপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। এই স্থানে এটিও স্মরণ রাখা উচিত, মুসায়লামাকে উত্তর দেবার সময় রসূল করীম (সা.)-এর উদ্দেশ্য এ ছিল না যে, তিনি (সা.) শাসনক্ষমতার অধিকার নিজ সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে চেয়েছিলেন। কারণ যদি এমনটি হতো, তবে তাঁর (সা.) প্রত্যাখ্যান করাটা আল্লাহ্‌র ওপর তাওয়াক্কুলের কারণে নয়, বরং স্বীয় সন্তানদের প্রতি ভালোবাসার কারণে সাব্যস্ত হতো। কিন্তু রসূল করীম (সা.) নিজ সন্তানদেরকে তাঁর (সা.) পরে স্থলাভিষিক্ত করেন নি, বরং হযরত আবু বকর (রা.)-র খিলাফতের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। এ থেকে বোঝা যায়, তাঁর (সা.) প্রত্যাখ্যান কোনো পার্থিব স্বার্থের জন্য ছিল না, বরং তা ছিল এক অসীম দৃঢ়বিশ্বাসের ফল।

একইভাবে এটিও স্মরণ রাখা উচিত, বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসায়লামা কাযযাবের সাহায্য লাভ করা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও ক্ষতিকর ছিল না। কারণ সে যদি শর্ত দিত, 'আমি আপনার আনুগত্য এই শর্তে করব যে, আপনি অমুক অমুক ধর্মীয় বিষয়ে আমার কথা মেনে নেবেন', তাহলেও এটি বলা যেতে পারত, তিনি (সা.) নিজের কথার জেদ বা পক্ষপাতিত্বের কারণে তার দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন। অর্থাৎ সে যে বলেছিল– আমার কথা মেনে নিন– তিনি (সা.) শুধুমাত্র নিজের কথার জেদ বজায় রাখার জন্যই তা অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু সে এমন কোনো কথা বলে নি যার দ্বারা বোঝা যায়, সে ধর্মে কোনো পরিবর্তন চেয়েছিল। সুতরাং, তাঁর (সা.) প্রত্যাখ্যান কেবল সেই তাওয়াক্কুল ও দৃঢ়বিশ্বাসেরই ফল ছিল, যা খোদা তা'লার ওপর তাঁর (সা.) ছিল। আরও একটি কথা স্মর্তব্য, তিনি (সা.) চাইলে সেই সময় মুসায়লামাকে ধরে হত্যা করাতে পারতেন, কারণ সে এক বিশাল দলবল নিয়ে এলেও তখনও মদীনায় ছিল এবং তাঁর (সা.) আয়ত্তের ভেতরে ছিল। কিন্তু এই ব্যাপারেও তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার ওপর তাওয়াক্কুল করেছিলেন যে, তিনি নিজেই এই কষ্টদানকারীকে ধ্বংস করবেন। اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ।

এখন আমি নামাযের পর কয়েকটি গায়েবানা জানাযা পড়াবো। কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করা হবে, তাদের মধ্যে প্রথম স্মৃতিচারণ হলো মোকাররম মির্যা সফদর মাহমুদ সাহেবের, যিনি মান্ডি বাহাউদ্দিনের বাসিন্দা মোকাররম গোলাম রসূল সাহেবের পুত্র ছিলেন। গত ২রা সেপ্টেম্বর মান্ডি বাহাউদ্দিনে তাকে শহীদ করা হয়েছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। কোনো এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি পিছু নিয়ে পেছন থেকে গুলি করে তাকে শহীদ করেছে। শাহাদাতের সময় মরহুমের বয়স ছিল ৬৫ বছর।

বিস্তারিত বিবরণ অনুযায়ী, যে দিন এই ঘটনা ঘটে, সেদিন মির্যা সফদর মাহমুদ সাহেব তার ওয়ার্কশপ থেকে মাগরিবের নামায আদায়ের জন্য মোটরসাইকেলে করে রওয়ানা হয়েছিলেন। পথে একটি নির্জন জায়গা পড়ত, সেটি অতিক্রম করার সময় কোনো এক অজ্ঞাত ব্যক্তি মোটরসাইকেলের পিছু নিয়ে পেছন থেকে গুলিবর্ষণ করে এবং মরহুমের গায়ে তিনটি গুলি লাগে, যার ফলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। ঘটনার পর হামলাকারী পালিয়ে যায়।

শহীদ মরহুমের পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা হয়েছিল তার নানী, গুজরাত জেলার খারিয়াঁ নিবাসী মোহতরমা হুসাইন বিবি সাহেবার মাধ্যমে। সাধারণত মানুষের পরিবারে পুরুষদের মাধ্যমে আহমদীয়াতের সূচনা হয়ে থাকে, কিন্তু এখানে একজন নারীর মাধ্যমে

তাদের পরিবারে আহমদীয়াত এসেছিল, যিনি দ্বিতীয় খিলাফতের প্রাথমিক যুগে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। পরবর্তীতে নানী মোহতরমা হুসাইন বিবি সাহেবার স্পৃহা ও তবলীগের ফলে শহীদ মরহুমের দাদা মোকাররম নবাব দীন সাহেব, যিনি তাদের আত্মীয় ছিলেন, তিনিও বয়আত গ্রহণ করেন। শহীদ মরহুম নিজ এলাকায় একজন বিশিষ্ট আহমদী ছিলেন এবং নিজ পেশা ও দক্ষতার দিক থেকে বিশেষ খ্যাতি রাখতেন। তিনি একজন মেকানিক ছিলেন এবং তার নিজস্ব ওয়ার্কশপ ছিল। বেশ ভালো ব্যাবসা ছিল। সত্যবাদিতা, নীতি-আদর্শের প্রতি আনুগত্য এবং মিথ্যার প্রতি ঘৃণা ছিল তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আগত প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে অত্যন্ত প্রফুল্লতা ও ভালোবাসার সাথে দেখা করতেন। অত্যন্ত উষ্ণতার সাথে সালাম করতেন। তার দোকান থেকে কোনো সাহায্যপ্রার্থী কখনো খালি হাতে ফিরে যেত না।

শহীদ মরহুমের স্ত্রী নাভিদা সাহেবা বর্ণনা করেন, খিলাফতের প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা ছিল। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়াও তিনি তাহাজ্জুদ আদায়কারী ছিলেন এবং নিয়মিত এমটিএ-র অনুষ্ঠানমালা থেকে উপকৃত হতেন। প্রতি মাসের এক তারিখে নিজের আয়ের হিসাব সম্পন্ন করে সেক্রেটারি মাল সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ করতেন। তিনি সেক্রেটারি মাল সাহেবের বাড়িতে গিয়ে তা দিয়ে আসতেন। প্রতিদিন নিয়মিত সদকা দিতেন, প্রতি মাসে ছাগলও সদকা করতেন। মসজিদের এবং অন্যান্য আর্থিক তহবিলে সবার আগে নিজের অংশ প্রদান করতেন। তিনি নিজে নেযামে ওসিয়্যতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং পরিবারের সকল সদস্যকেও ওসিয়্যতে অন্তর্ভুক্ত করিয়েছিলেন। কর্মচারীদের প্রতিও তিনি অনেক খেয়াল রাখতেন; তাদের কোনো আর্থিক প্রয়োজন দেখা দিলে বা কেউ অসুস্থ হলে তা তিনি পূরণ করতেন, তাদের সন্তানদের খেয়াল রাখতেন এবং তাদের খরচ মেটানোর চেষ্টা করতেন। তার একটি ওয়ার্কশপ ছিল। মানুষ সাধারণত উপার্জনের দিকে মনোযোগ দেয়, কিন্তু কোনো যাত্রীর গাড়ি যদি নষ্ট হয়ে যেত তবে তিনি খুব কম পারিশ্রমিকে কাজ করে দিতেন এবং অনেক সময় তো কিছু মানুষের কাজ বিনামূল্যেও করে দিতেন। যত ব্যস্ততাই থাকুক না কেন, জামা'তের অনুষ্ঠানাদিকে তিনি অগ্রাধিকার দিতেন। মান্ডি বাহাউদ্দিন জেলার আমীর সাহেব বলেন, শাহাদাতের সময় শহীদ মরহুম মান্ডি বাহাউদ্দিন শহরে জামা'তের সহকারী প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি জায়েদাদ, নায়েব যয়ীম আনসারুল্লাহ্ ও মুনতাযিম মাল আনসারুল্লাহ্ হিসেবে সেবা করার তৌফিক পাচ্ছিলেন। তার ওপর অনেক সেবার দায়িত্ব অর্পিত ছিল। মসজিদের দেখাশোনা তথা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও তার ওপর ন্যস্ত ছিল এবং চাবি তার কাছেই থাকত। প্রতি নামাযের সময় গিয়ে তিনি মসজিদ খুলতেন। ব্যবসায়ীরা সাধারণত এদিকে মনোযোগ দেয় না, কিন্তু তিনি প্রতি নামাযের সময় গিয়ে মসজিদ খুলতেন। মুরব্বী সিলসিলা মোযাফফর মাহমুদ সাহেব বলেন, তিনি (অর্থাৎ মরহুম) আমাকে বলেছেন, 'আমি বিগত ২৫ বছর ধরে প্রতিদিন ওয়ার্কশপে আসার আগে দুই রাকাত নফল নামায পড়ি।'

শহীদ মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারে তার স্ত্রী মোকাররমা নাভিদা সফদর সাহেবা ছাড়াও দুই ছেলে কামরান সফদর ও লুকমান সফদর রয়েছেন। তারা বিবাহিত। আল্লাহ্ তা'লা শহীদ মরহুমের মর্যাদা উন্নীত করুন এবং জান্নাতুল ফিরদৌসে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন, সকল আত্মীয়স্বজনকে উত্তম ধৈর্যশক্তি দান করুন এবং তাদের সাহায্যকারী ও সহায় হোন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ স্নেহের আমাতুল আজীজের, যিনি সম্প্রতি বাষট্টি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে তিনি ওসিয়্যতকারী ছিলেন। তিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এবং হযরত সৈয়্যদা উম্মে তাহের সাহেবার নাতনি ছিলেন এবং সাহেবযাদী আমাতুল হাকীম সাহেবা ও মুকাররম সৈয়্যদ দাউদ মুযাফফর শাহ সাহেবের কন্যা ছিলেন। সৈয়্যদ দাউদ মুযাফফর সাহেব উম্মে তাহেরের ভাতিজা এবং সৈয়্যদ মাহমুদুল্লাহ্ শাহ সাহেবের ছেলে ছিলেন। আমার খালাতো বোনও ছিলেন এবং আমার স্ত্রীর সবচেয়ে ছোটো বোনও ছিলেন। তার বিবাহ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) পড়িয়েছিলেন খালিদ জাফর সাহেবের সঙ্গে। তার প্রথম স্ত্রী ইন্তেকাল করেছিলেন এবং স্নেহের আমাতুল আজীজের সঙ্গে এটি ছিল তার দ্বিতীয় বিবাহ। আল্লাহ্ তা'লা তাকে দুটি পুত্রসন্তান দান করেছিলেন এবং উভয় পুত্রই যোগ্য। একজন ওকালতি পাস করে ওয়াকেফে যিন্দেগী হয়েছেন এবং রাবওয়ায় নাযারত উমুরে আম্মায় কাজ করছেন এবং ভালো ও যোগ্য উকিল। অপরজন হলেন হাশের জাফর। প্রথম ছেলের নাম মাহমুদ ইফতেখার এবং দ্বিতীয়জন হাশের আহমদ, তিনিও জার্মানিতে পড়াশোনা করেছেন এবং উচ্চশিক্ষা অর্জন করেছেন। উভয় ছেলে তাদের মায়েরও যথাসাধ্য অনেক সেবা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরও উত্তম প্রতিদান দিন এবং ভবিষ্যতেও তাদের মায়ের দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন এবং পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

মরহুমার জীবন যদিও অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে জীবন কাটিয়েছেন। তার মতো ধৈর্যশীল মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। মরহুমার ভাই সৈয়্যদ খালিদ আহমদ শাহ সাহেব বলেন, আমাদের এই বোন তার পিতা-মাতার অনেক সেবা করেছেন এবং মায়ের ইন্তেকালের পর বাবারও অনেক সেবা করেছেন। সহমর্মিতা ও দরিদ্রদের প্রতি যত্নশীলতার ক্ষেত্রে তিনি তার মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন। খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল অতুলনীয়। সন্তানদের তরবিয়ত তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে করেছেন। তার একটি বিশেষ গুণ ছিল, তিনি কারো বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতেন না এবং কারো (এমন) কথা শুনতেনও না। তিনি নিজের অন্তরকে পরিচ্ছন্ন রাখতেন। কারো কষ্ট তিনি দেখতে পারতেন না। নিজের কষ্ট সহ্য করার তার অনেক সাহস ও ধৈর্য ছিল। যেমনটি আমি বলেছি, তিনি অনেক ধৈর্য ধারণ করেছেন। ঝগড়া-বিবাদ থেকে বাঁচার জন্য তিনি নিজেকে দুনিয়ার ঝামেলা থেকে আলাদা করে নিয়েছিলেন। মানুষ তার সম্পর্কে ভুল কথাও বলেছে এবং মন্দ মন্তব্যও করেছে, কিন্তু তিনি কারো সঙ্গে ঝগড়া করেন নি। কিছু মানুষ সবখানেই থাকে যারা অন্যের বিরুদ্ধাচরণ করে। কিন্তু যা-ই হোক, তিনি কারো সঙ্গে ঝগড়া করেন নি, জবাবও দেন নি এবং কাউকে মানসিক কষ্টও দেন নি। অন্যদের কষ্ট তার সহ্য হতো না। তাদের সাহায্য করার জন্য তিনি ব্যাকুল থাকতেন। ছোটো শিশুদের তিনি খুব ভালোবাসতেন। তিনি অত্যন্ত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। নিজের প্রয়োজন নিজের অন্তরে লুকিয়ে রাখতেন, কারো কাছে তা প্রকাশ করতেন না। আল্লাহ্ তা'লার ওপর তার অসাধারণ ভরসা ছিল এবং আল্লাহ্ তা'লা তার আত্মমর্যাদা রক্ষা করতেন এবং অভাবনীয়ভাবে তার প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করে দিতেন।

তার বোন আমাতুর রউফ সাহেবা, যিনি মরহুম ডাক্তার কাসীর মুজতবা সাহেবের স্ত্রী, তিনি বলেন, আমার বোন খুব শান্ত স্বভাবের, নিরীহ, ধৈর্যশীল এবং অত্যন্ত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। তিনি দরিদ্রদের প্রতি যত্নশীল ছিলেন এবং অনেক বেশি সদকা ও দানখয়রাত করতেন। খিলাফতের প্রতি অসাধারণ সম্মান ও শ্রদ্ধা

প্রদর্শন করতেন এবং আমি যদি কখনো কোনো কথা বলতাম তাহলে তিনি তা সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিতেন। তিনি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তার ধারণা ছিল, আমি এমন রোগে আক্রান্ত হয়েছি যা থেকে আরোগ্য লাভ কঠিন; তাই হাসপাতালে গিয়ে কোনো লাভ নেই। কিন্তু আমি তাকে বললাম, আপনি হাসপাতালে যান এবং চিকিৎসা করান। প্রথমে তিনি অস্বীকার করেছিলেন, পরে রাজি হন এবং হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসাও করান।

তার ছেলে মাহমুদ ইফতেখার বলেন, মা আমাকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলতেন, তোমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পরিবারভুক্ত, এ কারণে তোমাদের ওপর দ্বিগুণ দায়িত্ব রয়েছে যে, তোমরা জামা'তের সেবা করবে। তিনি বলেন, খিলাফতে খামেসার সূচনালগ্নেই– যখন আমরা ছোটো শিশু ছিলাম– তিনি আমাদের দুইজনকে তাৎক্ষণিক চিঠি লিখিয়েছিলেন যে, যুগ-খলীফাকে চিঠি লেখো। আর তিনি আমাদের উপদেশ দিতেন, নিয়মিত চিঠি লিখবে। নামায ও খুতবা শোনার জন্য তিনি সবসময় উৎসাহিত করতেন। জামা'তের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে তার অনেক আত্মমর্যাবোধ ছিল এবং তিনি এটা সহ্য করতে পারতেন না যে, ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা হোক বা সমালোচনা করা হোক। তার ছেলে বলেন, তার সন্তানদের মধ্যে যে-ই ওয়াকফ করত, তাতে তিনি খুব খুশি হতেন এবং বলতেন, যারা ওয়াকফ করে তাদের কখনো আর্থিক সংকট হয় না। আর তার দুই ছেলের ব্যাপারেই তার ইচ্ছা ছিল, তারা যেন ওয়াকফ করে। একজন তো ওয়াকফ করেছেন। তিনি বলেন, আমি যখন ওয়াকফ করলাম, তখন মা আমাকে উপদেশ দিলেন, এখন তুমি ওয়াকফ তো করে ফেলেছ, কিন্তু এটি ভালোভাবে পালন করতে হবে। আর যখন আমার পদোন্নতি হলো এবং আমাকে নায়েব নাযের করা হলো, তখন তিনি বললেন, এখন এ ব্যাপারে কোনো গর্ব করবে না, বরং বিনয় অবলম্বন করবে।

দাপ্তরিক কাজের ব্যাপারে তিনি বলেন, আমার জন্য মা অনেক দোয়া করতেন। জামা'তের পরিস্থিতি সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করতেন। শুক্রবারের দিন আমার খোঁজখবর নিতেন এবং কোনো কাজ থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, কী করছ? আমি যদি বলতাম, এ সময় জামা'তের কাজ করছি, তখন বলতেন, ঠিক আছে, যদি জামা'তের কাজ থাকে তাহলে আগে জামা'তের কাজ শেষ করো, এরপর আমার এই কাজটি করে দিও। তিনি নিজের চেয়ে অন্য মানুষের ব্যাপারে বেশি চিন্তা করতেন এবং তাদের প্রয়োজনের প্রতি যত্নবান ছিলেন। তার ছেলে লিখেছেন, কেউ সাহায্য চাইলে মা অবশ্যই সাহায্য করতেন। তার মধ্যে সহনশীলতা ও ধৈর্য অনেক ছিল। নিজের কষ্ট সহ্য করে নিতেন, কিন্তু অন্যের কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না এবং চাইতেন, কখনো যেন অন্য কারো কষ্ট না হয়; আর অন্যের কষ্ট দূর করার চেষ্টা করতেন। তার সব ভাই-বোন, তাদের সন্তান এবং আমার পিতার প্রথম পক্ষের সন্তানদের সবার সঙ্গে তার অত্যন্ত ভালোবাসা ও স্নেহের সম্পর্ক ছিল এবং তিনি সবসময় তাদের প্রতি যত্নবান ছিলেন। আমাদের দুই ভাইকেও বলতেন, তোমরা সবসময় একত্রে থাকবে। তোমরা দুই মায়ের সন্তান হলেও তোমরা দুইজন সবসময় একসঙ্গে থাকবে এবং এক প্রাণ হয়ে থাকবে, আর কখনো ঝগড়া করবে না। তিনি কখনো এমন কোনো কথা বলেন নি যার কারণে আমার পিতার প্রথম পক্ষের সন্তানদের সঙ্গে আমাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হয়; বরং সবসময় ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যের সঙ্গে থাকার উপদেশ দিতেন।

আমিও এ বিষয়টি তার মাঝে দেখেছি, এ ব্যাপারে তিনি খুবই যত্নশীল ছিলেন। তার স্বামীর প্রথম স্ত্রী যেসব ছোটো সন্তান রেখে ইন্তেকাল করেছিলেন, তিনি তাদের নিজের

সন্তানদের মতোই দেখাশোনা করেছেন। যতটুকু সুযোগ ছিল, যে পরিস্থিতিই ছিল, সে অনুযায়ী তাদের জন্য যতটুকু করা সম্ভব ছিল– তিনি তা করেছেন।

তার ছেলে লিখেছেন, আমাদের শৈশবে আমাদের ব্যাপারে মায়ের সবচেয়ে বেশি চিন্তা ছিল আমাদের কুরআন শরীফ পড়া ও খতম করা। এ লক্ষ্যে তিনি নিয়মিত আমাদের কুরআন শরীফ পড়ানোর জন্য শিক্ষকের কাছে নিয়ে যেতেন এবং আবার নিয়ে আসতেন। সময়মতো নামায আদায়ের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। তিনি যখন তার পিতা-মাতার কথা উল্লেখ করতেন, তখন তাদের সেবার কথা অনেক বেশি বলতেন। আর এ প্রসঙ্গে এ কথাও বলতেন, হায়! তারা যদি জীবিত থাকতেন তাহলে দেখতেন, তারা কত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন, কিন্তু বর্তমানে আমাদের পরিস্থিতি তাদের তুলনায় অনেক ভালো এবং যথেষ্ট স্বচ্ছলতা রয়েছে। তার পিতা-মাতার সেবাকারীদেরও তিনি অনেক সেবা করতেন এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। এরপর এই ছেলে বলেন, মা আমাদের যা বলতেন, নিজে তার ওপর অনেক বেশি আমল করতেন। তিনি আমাদের পুণ্যবান বুযুর্গদের উপদেশপূর্ণ ঘটনাবলিও শোনাতেন। শৈশবে আমরা পড়তে শেখার পর প্রথম যে বইটি তিনি আমাদের পড়তে দিয়েছিলেন, সেটি হযরত সৈয়্যদনা বিলাল এবং সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেবের বিষয়ে ছিল।

অনুরূপভাবে চাঁদার ব্যাপারেও তার অনেক চিন্তা ছিল যেন শুরুতেই তা আদায় হয়ে যায় এবং কোনো চাঁদা আদায়ে বিলম্ব না হয়। তিনি (মরহুমা) বলতেন, একবার আমি চাঁদার ওয়াদা লিখিয়েছিলাম, কিন্তু টাকা ছিল না। এ নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলাম। তখন আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করলাম। আল্লাহ্ তা'লা অতি শীঘ্রই এর ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি বলেন, আমাদেরও উপদেশ দিতেন, নিয়মিত চাঁদা প্রদান করবে। তিনি সত্য স্বপ্ন দেখতেন। অন্যদের গোপন বিষয়াদির গোপনীয়তা সবসময় বজায় রাখতেন। তার স্বভাবে অন্যের দোষত্রুটি গোপন রাখার গুণ অনেক বেশি ছিল। অনুরূপভাবে তিনি বলেন, সত্যস্বপ্নের মধ্যে অন্যতম স্বপ্ন ছিল, আমার নাম মাহমুদ ইফতেখার– এটা তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন; হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে তাকে স্বপ্নে এই নাম দিয়েছিলেন। এরপর এই নাম রাখা হয়। তিনি লিখেছেন, তার জীবনে অনেক কঠিন সমস্যা ও বিপদ এসেছিল, কিন্তু কখনো কোনো কষ্টের কথা প্রকাশ করেন নি এবং সবসময় আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করতেন। শেষ অসুস্থতার সময়ও আমাদের খেয়াল রাখতেন। আমি যদি তার জন্য হাসপাতালে বা বাড়িতে জেগে থাকতাম তাহলে আমাকে বলতেন, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। আমি ঘুমিয়ে থাকলে নিজে আমাকে জাগাতেন না; বরং অপেক্ষা করতেন, আমি যখন জেগে উঠব তখন আমাকে কোনো কাজের কথা বলবেন। তিনি এমনটিই ছিলেন।

এরপর ছেলে লেখেন, তিনি নিজের আনন্দ বিসর্জন দিয়ে অন্যদের আনন্দকে গুরুত্ব দিতেন এবং ওয়াকেফে যিন্দেগিদের প্রতি অনেক সম্মান প্রদর্শন করতেন। অনুরূপভাবে তার ছোটো তথা দ্বিতীয় পুত্র হাশের, তিনিও পূর্বোক্ত ছেলের লেখা একই বিষয়গুলোর পুনরাবৃত্তি করছেন, তিনি তার নানীর মতো উদার মনের অধিকারী ছিলেন এবং কখনো দরিদ্রদের জন্য অর্থ ব্যয় করতে কার্পণ্য করতেন না। তিনি আমাকেও বলতেন, যদিও তুমি নিয়মিত ওয়াকফে নেই, তবুও দ্বীনের সেবা করো। আর যখন আমি তাকে জানালাম, আমি জার্মানিতে সেবা করছি, তখন তিনি এতে খুব খুশি হয়েছিলেন।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সঙ্গে ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন, তার মর্যাদা উন্নত করুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ মুকাররম রশীদ আহমদ আইয়ায সাহেবের। তিনি সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার পেনশনার ছিলেন। সম্প্রতি ৮৬ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে তিনি ওসিয়্যতকারী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও দুই কন্যা ও চার পুত্র রয়েছেন। তার এক ছেলে তাহের আহমদ জাফর সাহেব জামা'তের মুরব্বী এবং জামেয়াতুল মুবাশ্বিরীন ঘানার ভাইস প্রিন্সিপাল। নিজের দায়িত্বের কারণে, কর্মক্ষেত্রে অবস্থান করার কারণে তিনি তার পিতার জানাযায় অংশ নিতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও ধৈর্য ও মনোবল দান করুন। এই মুরব্বী সাহেবই লিখেছেন, আমাদের পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা হয়েছিল আমাদের প্রপিতামহ আবসারচুর নিবাসী মরহুম মুকাররম মিয়াঁ আল্লাহ্ দিত্তা সাহেবের মাধ্যমে এবং এরপর তাদের পরিবারে আহমদীয়াত বিস্তার লাভ করে। রশীদ আইয়ায সাহেব আহমদীয়া জামা'তের বিভিন্ন বিভাগে সেবা করেছেন এবং এরপর অবসর গ্রহণের পরও বিভিন্ন কাজ করেছেন। তিনি বলেন, তিনি নিয়মিত নফল নামায আদায় করতেন, নামাযের ব্যাপারে নিয়মিত ছিলেন, অধিক পরিমাণে যিকর-আযকার করতেন, অনেক বেশি দোয়া করতেন, খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পোষণকারী মানুষ ছিলেন, নিয়মিত কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন, চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত নিয়মিত ছিলেন এবং এর পূর্ণ রেকর্ড রাখতেন। তিনি যেহেতু ওসিয়তকারী ছিলেন, তাই নিজের জীবদ্দশাতেই হিস্যায়ে জায়েদাদ পরিশোধ করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)